ফেলুদা সমগ্র

ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. গ্রাম–ঘুরঘুটিয়া 2
২. একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে 15
৩. চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে 21
৪. পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে 25

১. গ্রাম—ঘুরঘুটিয়া

গ্রাম—ঘুরঘুটিয়া
পোঃ—পলাশী
জেলা—নদীয়া
৩রা নভেম্বর ১১৭৪

শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র মহাশয় সমীপেষু
আপনার কীর্তিকলাপের বিষয় অবগত হইয়া আপনার সহিত একটিবার সাক্ষাতের বাসনা জাগিয়াছে। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। অবশ্যই। সেটি আপনি আসিলে জানিতে পরিবেন। আপনি যদি তিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সক্ষম হন, তবে অবিলম্বে পত্র মারফত জানাইলে বাধিত হইব।
ঘুরাঘুটিয়া আসিতে হইলে পলাশী স্টেশনে নামিয়া সাড়ে পাঁচ মাইল দক্ষিণে যাইতে হয়। শিয়ালদহ হইতে একাধিক ট্রেন আছে; তন্মধ্যে ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জার দুপুর একটা আটান্ন মিনিটে ছাড়িয়া সন্ধ্যা ছটা এগারো মিনিটে পলাশী পৌঁছায়। স্টেশনে আমার গাড়ি থাকিবে। আপনি রাত্রে আমারই গৃহে অবস্থান করিয়া পরদিন সকালে সাড়ে দশটায় একই ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ফিরিতে পরিবেন।

ইতি আশীর্বাদক
শ্রীকালীকিঙ্কর মজুমদার

চিঠিটা পড়ে ফেলুদাকে ফেরত দিয়ে বললাম, ‘পলাশী মানে কি সেই যুদ্ধের পলাশী?’

আর কটা পলাশী আছে ভাবছিস বাংলাদেশে? বলল ফেলুদা।তবে তুই যদি ভাবিস যে সেখানে এখনও অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে, তা হলে খুব ভুল করবি। কিসু

নেই। এমন কী সিরাজদ্দৌল্লার আমলে যে পলাশবন থেকে পলাশীর নাম হয়েছিল, তার একটি গাছও এখন নেই।

তুমি কি যাবে?

ফেলুদা চিঠিটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, বুড়ো মানুষ ডাকছে এভাবে!—তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা কী সেটা জানারও একটা কৌতুহল হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা—পাড়াগাঁয়ে শীতকালের সকাল-সন্ধেতে মাঠের উপর কেমন ধোঁয়া জমে থাকে দেখেছিস? গাছগুলোর গুড়ি আর মাথার উপরটা খালি দেখা যায়। আর সন্ধেটা নামে ঝাপ করে, আর তারপরেই কনকনে ঠাণ্ডা, আর—নাঃ, এ সব কতকাল দেখিনি। —তোপ্‌সে, দে তো একটা পোস্টকার্ড।

চিঠি পৌঁছাতে তিন-চার দিন লেগে যেতে পারে হিসেব করেই ফেলুদা যাবার তারিখটা জানিয়েছিল কালীকিঙ্কর মজুমদারকে। আমরা সেই অনুযায়ী ৩৬৫ আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে চেপে পলাশী পীছলাম বারেই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছাঁটায়। ট্রেনের কামরা থেকেই ধান ক্ষেতের উপর ঝাপ করে সন্ধে নামা দেখছি। স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন চারিদিকে বাতিটাতি জ্বলে গেছে, যদিও আকাশ পুরোপুরি অন্ধকার হয়নি। কালেক্টরবাবুর কাছে টিকিট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যে গাড়িটা চোখে পড়ল সেটাই যে মজুমদার মশাইয়ের গাড়ি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এরকম গাড়ি আমি কখনও দেখিনি; ফেলুদা বলল ছেলেবেলায় এক-আধটা দেখে থাকতে পারে, তবে নামটা শোনা এটুকু বলতে পারে। কাপড়ের হুডওয়ালা, অ্যাম্বাসডরের চেয়ে দেড় লম্বা আমেরিকান গাড়ি, নাম হাপমোবিল। গায়ের গাঢ় লাল রং এখানে ওখানে চটে গেছে, হুডের কাপড়ে তিন জায়গায় তল্পি, তাও কেন জানি গাড়িটাকে দেখলে বেশ সমীহ হয়।

এমন গাড়ির সঙ্গে উর্দিপরা ড্রাইভার থাকলে মানাত ভাল; যিনি রয়েছেন তিনি পরে আছেন সাধারণ ধুতি আর সাদা শার্ট। তিনি গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন,

আমাদের এগিয়ে আসতে দেখে সেটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মজুমদার বাড়িতে আপনারা?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বলল ফেলুদা, ঘুরাঘুটিয়া।

আসুন।

ড্রাইভার দরজা খুলে দিলেন, আমরা চল্লিশ বছরের পুরানো গাড়ির ভিতর ঢুকে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলাম। ড্রাইভার হ্যান্ডল মেরে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ঘুরাঘুটিয়ার দিকে রওনা করিয়ে দিলেন।

রাস্তা ভাল নয়, গাড়ির স্প্রিংও পুরনা, তাই আরাম বেশিক্ষণ টিকল না। তবুও, পলাশীর বাজার ছাড়িয়ে গাড়ি গ্রামের খোলা রাস্তায় পড়তেই চোখ আর মন এক সঙ্গে জুড়িয়ে গেল। ফেলুদা ঠিকই বলেছিল; ধানে ভরা ক্ষেতের ওপরে গাছপালায় ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আর তারই আশেপাশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে মেঘের মতো মাটি থেকে আট-দশ হাত উপরে। চারিদিক দেখে মনে হচ্ছিল একেই বোধ হয় বলে ছবির মতো

এরকম একটা জায়গায় যে আবার একটা পুরনা জমিদার বাড়ি থাকতে পারে সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না; কিন্তু মিনিট দশেক চলার পর রাস্তার দুপাশের গাছপালা দেখে বুঝতে পারলাম। আম জাম কাঁঠাল ভরা একটা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলেছি। তারপর রাস্তাটা ডান দিকে ঘুরে একটা পোড়ো মন্দির পেরোতেই সামনে দেখতে পেলাম নহবৎখানা সমেত একটা শেওলাধরা প্রকাণ্ড সাদা ফটক। আমাদের গাড়িটা তিনবার হর্ন দিয়ে। ফটকের ভিতরে ঢুকতেই সামনে বিশাল বাড়িটা বেরিয়ে পড়ল।

পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে লালটাল উবে গিয়ে এখন শুধু একটা গাঢ় বেগুনি ভাব রয়েছে। অন্ধকার বাড়িটা আকাশের সামনে একটা পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার অবস্থা যে প্রায় যাদুঘরে রাখার মতো সেটা কাছে গিয়েই বুঝতে পারলাম।

দেয়ালে স্যাঁতা ধরেছে, সবঙ্গে পলেস্তারা খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে, সেই ইটের মধ্যেও আবার ফাটল ধরে তার ভিতর থেকে গাছপালা গজিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা প্রশ্ন করল, এদিকে ইলেকট্রিসিটি নেই বোধহয়? আজ্ঞে না। বলল ড্রাইভার, তিন বছর থেকে শুনছি। আসবে আসবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান থেকে উপর দিকে চাইলে দোতলার অনেকগুলো ঘরের জানালা দেখা যায়; কিন্তু তার একটাতেও আলো আছে বলে মনে হল না। ডান দিকে কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট্ট ঘর দেখা যাচ্ছে, যাতে টিমটম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। বোধহয় মালী বা দারোয়ান বা ওইরকম কেউ থাকে। ঘরটাতে। মনে মনে বললাম, ফেলুদা ভাল করে খোঁজখবর না নিয়ে এ কোথায় এসে হাজির হল কে জানে।

একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ল বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাইরের জমিতে। তারপরেই একজন বুড়ে চাকর এসে দরজার মুখটাতে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ড্রাইভার গাড়িটাকে নিয়ে গেছে বোধহয় গ্যারেজের দিকে। চকেরটা ভুরু কুঁচকে একবার আমাদের দিকে দেখে নিয়ে বলল, ভিতরে আসুন। আমরা দুজনে তার পিছন পিছন বাড়ির ভিতর ঢুকলাম।

লম্বায়-চওড়ায় বাড়িটা যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আর সবই কেমন যেন ছোট ছোট। দরজাগুলো বেঁটে বেঁটে, জানালাগুলো কলকাতার যে কোনও সাধারণ বাড়ির জানালার অর্ধেক, ছাতটা প্রায় হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়। ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বলল দেড়শো-দুশো বছর আগের বাংলা দেশের জমিদার বাড়িগুলোর বেশির ভাগই নাকি এই রকমই ছিল।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই একটা আশ্চর্য নতুন জিনিস দেখলাম। ফেলুদা বলল, একে বলে চাপা-দরজা। ডাকাতদের আটকাবার জন্য এরকম দরজা তৈরি হত। এ দরজা বন্ধ করলে আর খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে না ভাঁজ হয়ে

মাথার উপরে সিলিং-এর মতো টেরচাভাবে শুয়ে পড়ে। দরজার গায়ে যে ফুটাগুলো দেখছিস, সেগুলো দিয়ে বল্লম ঢুকিয়ে ডাকাতদের খুঁচিয়ে তাড়ানো হত।

দরজা পেরিয়ে একটা লম্বা বারান্দা, তার শেষ মাথায় কুলঙ্গিতে একটা প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে একটা দরজা দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম আমরা তিনজনে।

এ ঘরটা বেশ বড়। আরও বড় মনে হত যদি এত জিনিসপত্র না থাকত। একটা প্রকাণ্ড খাট ঘরের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে আছে। তার মাথার দিকে বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে তিনটে, একটা এমনি আলমারি, আর মেঝে থেকে ছাত অবধি বইয়ে ঠাসা বাঁ পাশে একটা টেবিল, তার পাশে একটা সিন্দুক। এ ছাড়া চেয়ার রয়েছে আর রয়েছে খাটের উপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোয়া একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। টেবিলের উপর রাখা একটা মোমবাতির আলো, তাঁর মুখে পড়েছে, আর সেই আলোতে বুঝতে পারছি সাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁক দিয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসছেন।

বসুন, বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। নাকি বোসো বলব? তুমি তো দেখছি বয়সে আমার চেয়ে অর্ধেকেরও বেশি ছাট। তুমিই বলি, কী বলে?

নিশ্চয়ই!

ফেলুদা আমার কথা চিঠিতেই লিখে দিয়েছিল, এখন আলাপ করিয়ে দিল। একটা জিনিস লক্ষ করলাম যে আমাদের দুজনেরই নমস্কারের উত্তরে উনি কেবল মাথা নাড়লেন।

খাটের সামনেই দুটো পাশাপাশি চেয়ারে বসলাম আমরা দুজনে।

চিঠিটা পেয়ে কৌতুহল হয়েছিল নিশ্চয়ই ভদ্রলোক হালকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

না হলে আর অ্যাদুর আসি?

বেশ, বেশ। মজুমদার মশাই সত্যিই খুশি হয়েছেন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।না এলে আমি দুঃখ পেতাম। মনে করতাম তুমি দাম্ভিক। আর তা ছাড়া তুমিও একটা পাওনা থেকে বঞ্চিত হতে। অবিশ্যি জানি না। এ সব বই তোমার আছে কি না।

ভদ্রলোকের দৃষ্টি টেবিলের দিকে ঘুরে গেল। চারটে মোটা মোটা বই রাখা রয়েছে মোমবাতির পাশেই। ফেলুদা উঠে গিয়ে বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখে বলল, সর্বনাশ, এ যে দেখছি সবই দুষ্প্রাপ্য বই। আর প্রত্যেকটা আমার পেশা সম্পর্কে। আপনি নিজে কি কোলওকালে- ?

না, ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমি নিজে কোনওদিন গোয়েন্দাগিরি করিনি। ওটা বলতে পার আমার যুঝিবয়সের একটা শখ বা হবি। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে আমাদের পরিবারে একটা খুন হয়। পুলিশ লাগানো হয়। ম্যালকম বলে এক সাহেব-গোয়েন্দা খুনি ধরে দেয়। সেই ম্যালকমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমার গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কে কৌতুহল হয়। তখনই এইসব বই কিনি। সেই সঙ্গে অবিশ্যি গোয়েন্দা কাহিনী পড়ারও খুব শখ হয়। এমিল গ্যাবেরিও-র নাম শুনেছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল। ফেলুদা, ফরাসি লেখক, প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন।

হুঁ, মাথা নেড়ে বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার, তার সব কটা বই আমার আছে। আর তা ছাড়া এডগার অ্যালেন পো, কোনান ডয়েল, এ তো আছেই। বই যা কিনেছি তার সবই চল্লিশ বছর বা তারও বেশি আগে। তার চেয়ে বেশি আধুনিক কিছু নেই আমার কাছে। আজকাল অবিশ্যি এ লাইনের কাজ অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছে, অনেক সব নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তবে তোমার বিষয় যেটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় তুমি আরও সরলভাবে, প্রধানত মস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে কাজ করছ। আর বেশ সাক্সেসফুলি করছি। –কথাটা ঠিক বলেছি কি?

সাক্সেসের কথা জানি না, তবে পদ্ধতি সম্বন্ধে যেটা বললেন সেটা ঠিক।

সেটা জেনেই আমি তোমাকে ডেকেছি।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। ফেলুদা নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। মোমবাতির স্থির শিখটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কালীকিঙ্করবাবু বললেন, আমার যে শুধু সত্তরের উপর বয়স হয়েছে তা নয়, আমার শরীরও ভাল নেই। আমি চলে গেলে এ সব বইয়ের কী দশা হবে জানি না; তাই ভাবলাম অন্তত এই কাটা যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি তা হলে এগুলোর যত্ব হবে, কদর হবে।

ফেলুদা অবাক হয়ে তাকের বইগুলোর দিকে দেখছিল। বলল, এ সবই কি আপনার নিজের বই?

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, বইয়ের শখ মজুমদার বংশে একমাত্র আমারই। আর নানা বিষয়ে যে উৎসাহ ছিল আমার সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

তা তো বটেই। আর্কিয়লজির বই রয়েছে, আর্টের বই, বাগান সম্বন্ধে বই, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী...এমন কী থিয়েটারের বইও তো দেখছি। তার মধ্যে কিছু বেশ নতুন বলে মনে হচ্ছে। এখনও বই কেনেন নাকি?

তা কিনি বইকী। রাজেন বলে আমার একটি ম্যানেজার গোছের লোক আছে, তাকে মাসে দু-তিনবার করে কলকাতায় যেতে হয়, তখন লিস্ট করে দিই, ও কলেজ স্ট্রিট থেকে নিয়ে আসে।

ফেলুদা টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর দিকে দেখে বলল, আপনাকে যে কী বলে। ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না।

কালীকিঙ্করবাবু বললেন, বইগুলো নিজের হাতে করে তোমার হাতে তুলে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম, কিন্তু আমার দুটো হাতই অকেজো হয়ে আছে।

আমরা দুজনেই একটু অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। উনি হাত দুটো কম্বলের তলায় ঢুকিয়ে রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেটার যে কোনও বিশেষ কারণ আছে সেটা বুঝতে পারিনি।

আরথ্রাইটিস জানো তো? যাকে সোজা বাংলায় বলে গেটে বাত। হাতের আঙুলগুলো আর ব্যবহার করতে পারি না। এখন অবিশ্যি আমার ছেলে কিছুদিন হল এখানে এসে রয়েছে, নইলে আমার চাকর গোকুলই আমাকে খাইয়ে-টাইয়ে দেয়।

আপনার চিঠিটা কি আপনার ছেলে লিখেছিলেন?

না, ওটা লিখেছিল রাজেন। বৈষয়িক ব্যাপারগুলো ওই দেখে। ডাক্তার ডাকার দরকার হলে গাড়ি করে গিয়ে নিয়ে আসে বহরমপুর থেকে। পলাশীতে ভাল ডাক্তার নেই।

লক্ষ করছিলাম, ফেলুদার দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে ঘরের কোনায় রাখা সিন্দুকটার দিকে। ও বলল, আপনার সিন্দুকটার একটু বিশেষত্ব আছে বলে মনে হচ্ছে। তালা-চাবির ব্যবস্থা নেই দেখছি। কম্বিনেশনে খোলে বুঝি?

কালীকিঙ্করবাবু হেসে বললেন, ঠিক ধরেছ। একটা বিশেষ সংখ্যা আছে; সেই অনুযায়ী নবটা ঘোরালে তবে খোলে। এ সব অঞ্চলে এককালে ডাকাতদের খুব উপদ্রব ছিল, জানো তো। আমার পূর্বপুরুষই তো ডাকাতি করে জমিদার হয়েছে। তারপর আবার আমরাই ডাকাতের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছি। তাই মনে হয়েছিল তালার বদলে কম্বিনেশন করলে হয়তো আর একটু নিরাপদ হবে।

কথাটা শেষ করে ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবলেন। তারপর তাঁর চাকরের নাম ধরে একটা হাঁক দিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো গোকুল এসে হাজির হল। কালীকিঙ্করবাবু বললেন, একবার খাঁচাটা আন তো গোকুল। এঁদের দেখাব।

গৌকুল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই একটা খাঁচায় একটি টিয়া নিয়ে এসে হাজির। মোমবাতির আলোয় টিয়ার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

কালীকিঙ্করবাবু পাখিটার দিকে চেয়ে বললেন, বলো তো মা,-ত্রিনয়ন, ত্রিনয়ন—বলো তো।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর আশ্চর্য পরিষ্কার গলায় পাখি বলে উঠল, ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন!

আমি তো থ। পাখিকে এত পরিষ্কার কথা বলতে কখনও শুনিনি। কিন্তু ওখানেই শেষ না। সঙ্গে আরও দুটো কথা জুড়ে দিল টিয়া—একটু জিরো!

তারপর আবার পুরো কথাটা পরিষ্কার করে বলে উঠল। টিয়া।-ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন-একটু জিরো।

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেছে। বলল, ত্রিনয়ন কে?

কালীকিঙ্করবাবু হো হা করে হেসে উঠে বললেন, সেটি বলব না তোমাকে। শুধু এইটুকু বলব যে, যেটা বলছে সেটা হল একটা সংকেত। বারো ঘণ্টা সময় আছে তোমার। দেখো তো তুমি সংকেতটা বার করতে পার কি না। আমার সিন্দুকের সঙ্গে সংকেতটার যোগ আছে বলে দিলাম।

ফেলুদা বলল, টিয়াকে ওটা শেখানোর পিছনে কোনও উদ্দেশ্য আছে কি না সেটা জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পার, বললেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। বয়সের সঙ্গে অধিকাংশ মানুষের স্মরণশক্তি কমে আসে সেটা জানো তো? বছর তিনেক আগে এক'দিন সকালে হঠাৎ দেখি সিন্দুকের সংকেতটা মনে আসছে না। বিশ্বাস করবে?–সারাদিন চেষ্টা করেও নম্বরটা মনে করতে পারিনি। শেষটায় মনে পড়ল। মাঝরাত্তিরে! নম্বরটা লিখে রাখিনি কোথাও,

কারণ কখন যে কার কী অভিসন্ধি হয় সেটা তো বলা যায় না। তাই মনে হয়েছিল ওটা মাথায় রাখাই ভাল। এক আমার ছেলে জানত, কিন্তু সে থাকে বাইরে বাইরে। তাই পরদিনই একটি টিয়া সংগ্রহ করে নম্বরটা একটা সাংকেতিক চেহারা দিয়ে পাখিটাকে পড়িয়ে দিই। এখন ও মাঝে মাঝেই সংকেতটা বলে ওঠে-অন্য পাখি। যেমন বলে রাধাকিষণ বা ঠাকুর ভাত দাও।

ফেলুদা সিন্দুকটার দিকে দেখছিল। হঠাৎ ভ্রূকুটি করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। তারপর ফিরে এসে টেবিলের উপর থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আবার গেল সিন্দূকটার দিকে।

কী দেখছ ভাই? বললেন কালীকিঙ্করবাবু। তোমার ডিটেকটিভের চোখে কিছু ধরা পড়ল নাকি?

ফেলুদা সিন্দুকের সামনেটা পরীক্ষা করে বলল, আপনার সিন্দুকের দরজার উপর কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয়। বোধহয় কেউ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করেছিল।

কালীকিঙ্করবাবু গভীর হয়ে গেলেন।

তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত?

ফেলুদা মোমবাতিটা আবার টেবিলের উপর রেখে বলল, ঝাড়পোঁছ করতে গিয়ে এরকম দাগ পড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু এ ধরনের ঘটনার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? সেটা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

কালীকিঙ্করবাবু একটু ভেবে বললেন, বাড়িতে লোক বলতে তো আমি, গোকুল, রাজেন, আমার ড্রাইভার মণিলাল ঠাকুর আর মালী; আমার ছেলে বিশ্বনাথ দিন পাঁচেক হল এসেছে। ও থাকে। কলকাতায়। ব্যবসা করে। আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিশেষ নেই। এবারে এসেছে—ওই যা বললাম—আমার অসুখের খবর পেয়ে। গত সোমবার সকালে

আমার বাগানের বেঞ্চিটায় বসে ছিলাম। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চোখে অন্ধকার দেখে আবার বেঞ্চিতেই পড়ে যাই। রাজেন পলাশী থেকে বিশ্বনাথকে ফোন করে দেয়। ও পরদিনই ডাক্তার নিয়ে চলে আসে। মনে হচ্ছে একটা ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল। যাইহোক- আমার এমনিতেও আর বেশিদিন নেই সেটা আমি জানি। এই শেষ কটা দিন কি সংশয়ের মধ্যে কাটাতে হবে? আমার ঘরে ঢুকে ডাকাত আমার সিন্দুক ভাঙবে?

ফেলুদা কালীকিঙ্করবাবুকে আশ্বাস দিল।

আমার সন্দেহ নির্ভুল নাও হতে পারে। হয়তো সিন্দুকটা যখন প্রথম বসানো হয়েছিল তখন ঘষাটা লেগেছিল। দাগগুলো টাটকা না পুরনো সেটা এই মোমবাতির আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে আর একবার দেখব। আপনার চাকরিটি বিশ্বাসী তো?

গোকুল আছে প্রায় ত্রিশ বছর।

আর রাজেনবাবু? রাজেনও পুরনো লোক। মনে তো হয় বিশ্বাসী। তবে ব্যাপারটা কী জান- আজ যে বিশ্বাসী, কাল যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এমন তো কোনও গ্যারান্টি নেই।

ফেলুদা মাথা নেড়ে কথাটায় সায় দিয়ে বলল, যাই হোক, গোকুলকে বলবেন একটু দৃষ্টি রাখতে। আমার মনে হয় না চিন্তার কোনও কারণ আছে।

যাক।

কালীকিঙ্করবাবুকে খানিকটা আশ্বস্ত বলে মনে হল। আমরা উঠে পড়লাম। ভদ্রলোক বললেন, গোকুল তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেবে। লেপ কম্বল তোশক বালিশ মশারি-সব কিছুরই ব্যবস্থা আছে। বিশ্বনাথ একটু বহরমপুরে গেছে-এই ফিরল বলে। ও এলে তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে নিয়ো। কাল সকালে যাবার আগে যদি চাও তো আমার গাড়িতে করে আশেপাশে একটু ঘুরে দেখে নিয়ো। যদিও দ্রষ্টব্য বলে খুব যে একটা কিছু আছে তা নয়।

ফেলুদা টেবিলের উপর থেকে বইগুলো নিয়ে এল। গুড নাইট করার আগে কালীকিঙ্করবাবু আর একবার হেঁয়ালির কথাটা মনে করিয়ে দিলেন। –

ওটার সমাধান করতে পারলে তোমাকে আমার গ্যাবোরিওর সেটটা উপহার দেব।

গোকুল আমাদের সঙ্গে নিয়ে দুটো বারান্দা পেরিয়ে আমাদের ঘর দেখিয়ে দিল।

আগে থেকেই ঘরে একটা লণ্ঠন রাখা ছিল। সুটকেস আর হান্ড অলও দেখলাম ঘরের এক কোণে রাখা রয়েছে। কালীকিঙ্করবাবুর ঘরের চেয়ে এ ঘরটা ছোট হলেও, জিনিসপত্র কম থাকতে হাঁটাচলার জায়গা এটাতে একটু বেশিই। ফরসা চাদর পাতা খাটের উপর বসে ফেলুদা বলল, সংকেতটা মনে পড়ছে, তোপ্‌সে?

এইরে। ত্রিনয়ন নামটা মনে আছে, কিন্তু সমস্ত সংকেতটা জিজ্ঞেস করে ফেলুদা প্যাঁচে ফেলে দিয়েছে।

পারলি না তো? ঝোলা থেকে আমার খাতটি বার করে সংকেতটা লিখে ফেল। গ্যাবোরিওর বইগুলোর ওপর বেজায় লোভ হচ্ছে।

খাতা পেনসিল নিয়ে বসার পর ফেলুদা বলল, আর আমি গোটা গোটা অক্ষরে লিখে ফেললাম।–

ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন–একটু জিরো।

লিখে নিজেরই মনে হল এ আবার কীরকম সংকেত। এর তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না! ফেলুদা এর সমাধান করবে। কী করে?

ফেলুদা এদিকে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে জানালা খুলে বাইরে দেখছে। জ্যোৎস্না রাত। বোধহয় পূর্ণিমা। আমি ফেলুদার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা বাড়ির পিছন দিক। ফেলুদা

বলল, একটা পুকুর-টুকুর গোছের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে ডান দিকটায়! ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে জল চিক্‌মিক্‌ করছে সেটা আমিও দেখেছি।

২. একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে

একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলেছে। তার সঙ্গে এই মাত্র যোগ হল শেয়ালের ড্রাক। আমার মনে হল এত নির্জন জায়গায় এর আগে কখনও আসিনি।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা হওয়া আসছিল, ফেলুদা পাল্লা দুটো বন্ধ করতেই একটা মটারের অ্যাওয়াজ পেলাম। এটা অন্য গাড়ি, সেই বিশাল প্রাচীন আমেরিকান গাড়ি নয়।

বিশ্বনাথ মজুমদার এলেন বলে মনে হচ্ছে ফেলুদা মন্তব্য করল। তার মানে এবার খেতে ডাকবে। সত্যি বলতে কী, বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। একটায় ট্রেন ধরব বলে। সকালে খেয়ে বেরিয়েছি; পথে রাণাঘাট স্টেশনে অবিশ্যি মিষ্টি আর চা খেয়ে নিয়েছিলাম। হয়তো এমনিতে খিদে পেত না, কারণ ঘড়িতে বলছে সবেমাত্র আটটা বেজেছে, কিন্তু এখানে তো আর কিছু করার নেই-এমন কী লণ্ঠনের আলোতে বইও পড়া যাবে না।-তাই মনে হচ্ছিল খেয়ে-দোয়ে কম্বলের তলায় ঢুকতে পারলে মন্দ হয় না।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি, এবার দেখলাম আমাদের ঘরের দেওয়ালে একটা ছবি রয়েছে, আর ফেলুদা সেটার দিকে চেয়ে আছে। ফোটো নয়; আঁকা ছবি আর বেশ বড়। সেটা যে কালীকিঙ্করবাবুর পূর্বপুরুষের ছবি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। খালি গায়ে বসে আছেন বাবু চেয়ারের উপর; পাকানো গোঁফ, কাঁধ অবধি লম্বা চুল, টানাটানা চোখ, আর বিরাট চওড়া কাঁধ।

মুগুর ভাঁজা কুস্তি করা শরীর, ফিস ফিস্ করে বলল ফেলুদা। মনে হচ্ছে ইনিই সেই প্রথম ডাকাত জমিদার।

বাইরে পায়ের শব্দ। আমরা দুজনেই দরজার দিকে চাইলাম। গোকুল বাইরে একটা লণ্ঠন, রেখে গিয়েছিল, তার আলোটা ঢেকে প্রথমে একটা ছায়া ঘরের মেঝেতে পড়ল, আর তারপর একটা অচেনা মানুষ চৌকাঠের বাইরে এসে দাঁড়াল।

ইনিই কি বিশ্বনাথ মজুদার? না, হতেই পারে না। খাটা করে পর ধূতি, গায়ে ছাই রঙের পাঞ্জাবি, ঝুপে গোঁফ আর চোখে পুরু চশমা। ভদ্রলোক গলা বাড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বোধহয় আমাদের খুঁজছেন।

কিছু বলবেন রাজেনবাবু? ফেলুদা প্রশ্ন করল?

ভদ্রলোক যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেলেন। এবার সর্দি-বসা গলায় কথা এল–

ছোটবাবু ফিরেছেন। ভাত দিতে বলেছি; গোকুল আপনাদের খবর দেবে।

রাজেনবাবু চলে গেলেন।

কীসের গন্ধ বলো তো? আমি জিজ্ঞেস করলাম ফেলুদাকে।

বুঝতে পারছিস না? ন্যাফথ্যালিন। গরম পাঞ্জাবিটা সবেমাত্র বার করেছে ট্রাঙ্ক থেকে।

রাজেনবাবুর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুঝতে পারলাম। আমরা কী আশ্চর্য থমথমে পরিবেশের মধ্যে রয়েছি। এরকম জায়গায় দিনের পর দিন মানুষ থাকে কী করে? ফেলুদা পাশে থাকলে সাহসের অভাব হবে না জানি, কিন্তু না থাকলে এই আদ্যিকালের পোড়ো জমিদার বাড়িতে পাঁচ মিনিটও থাকার সাধ্যি হত না আমার। কালীকিঙ্করবাবু আবার নিজেই বললেন এ বাড়িতে নাকি এককালে খুন হয়েছিল। কোন ঘরে কে জানে!

ফেলুদা এর মধ্যে লণ্ঠন সমেত টেবিলটাকে কাছে টেনে এনে খাটে বসে খাতা খুলে সংকেত নিয়ে ভাবা শুরু করে দিয়েছে। দু-একবার যেন ত্রিনয়ন বলে বিড়বিড় করতেও শুনলাম। আমি আর কী করি, দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ওটা কী? বুকটা ধড়াস করে উঠল। কী জানি একটা নড়ে উঠেছে বারান্দার ওদিকটায়-যেখানে লণ্ঠনের আলো অন্ধকারে মিশে গেছে।

দাঁত দাঁতে চেপে রইলাম অন্ধকারের দিকে। এবার বুঝলাম ওটা একটা বেড়াল। ঠিক সাধারণ সাদা বা কালো বেড়াল নয়; এটার গায়ে বাঘের মতো ডোরা। বেড়ালটা কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টি চেয়ে থেকে একটা হাই তুলে উলটা দিকে ফিরে হেলতে দুলতে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার কিছু পরেই শুনলাম কর্কশ গলায় টিয়ার ডাক। তারপরেই আবার সব চুপচাপ। বিশ্বনাথ বাবুর ঘরটা কোথায় কে জানে। তিনি কি দোতলায় থাকেন না একতলায়? রাজেনবাবুই বা কোথায় থাকেন? আমাদের এমন ঘর দিয়েছে কেন যেখান থেকে কারুর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না?

আমি ঘরে ফিরে এলাম! ফেলুদা খাটের উপর পা তুলে দিয়ে খাতা হাতে নিয়ে ভাবিছে! আর না পেরে বললাম, এরা এত দেরি করছে কেন বলে তো?

ফেলুদা ঘড়ি দেখে বলল, তা মন্দ বলিসনি। প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল। বলেই আধার খাতার দিকে মন দিল।

আমি ফেলুদার পাওয়া বইগুলো উলটে-পালটে দেখলাম। একটা বই আঙুলের ছাপ সম্বন্ধে, একটার নাম ক্রিমিনালজি, আর একটা ক্রাইম অ্যান্ড ইটস ডিটেকশন। চার নম্বর বইটার নামের মানেই বুঝতে পারলাম না। তবে এটায় অনেক ছবি রয়েছে, তার মধ্যে পর পর দশ পাতায় শুধু বিভিন্ন রকমের পিস্তল আর বন্দুক। ফেলুদা রিভলভারটা সঙ্গে এনেছে কি?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই মনে পড়ল ফেলুদা তো গোয়েন্দাগিরি করতে আসেনি; আর সেটার কোনও প্রয়োজনও নেই। কাজেই রিভলভারেরই বা দরকার হবে কেন?

বইগুলো সুটকেসে রেখে খাটে বসতে যাব, এমন সময় আচমকা অচেনা গলার আওয়াজ পেয়ে বুকটা আবার ধড়াস করে উঠল।

এবারের লোকটিকে চেনায় কোনও অসুবিধা নেই। ইনি গোকুল নন, রাজেনবাবু নন; গাড়ির ড্রাইভার নিন, আর রান্নার ঠাকুর তো ননই। কাজেই ইনি বিশ্বনাথবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না।

আপনাকে অনেক দেরি করিয়ে দিলাম, ভদ্রলোক ফেলুদাকে নমস্কার করে বললেন। আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার।

সেটা আমার বলে দিতে হয় না। ধাপের সঙ্গে বেশ মিল আছে চেহারায়। বিশেষ করে। চোখ আর নাকে। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে, মাথার চুল এখনও সবই কাঁচা, গোঁফ-দাড়ি নেই, ঠোঁট দুটো অসম্ভব রকম পাতলা। ভদ্রলোককে আমার ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না সেটা অবিশ্যি বলা মুশকিল। একটা কারণ বোধহয় উনি আমাদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন, আর আরেকটা কারণ—যদিও এটা ভুল হতে পারে—ভদ্রলোক আমাদের দিকে চেয়ে হাসলেও সে হাসিটা কেন জানি খাঁটি বলে মনে হল না; যেন আসলে সত্যি করে। আমাদের দেখে খুশি হননি, সেটা হবেন আমরা চলে গেলে পর।

ফেলুদা আর আমি বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে নীচে নেমে সোজা গিয়ে হাজির হলাম খাবার ঘরে; আমি ভেবেছিলাম মাটিতে বসে খেতে হবে—এখন দেখছি বেশ বড় একটা ডাইনিং টেবিল রয়েছে, আর তার উপরে রুপোর থালা বাটি গেলাস সাজানো রয়েছে।

যে-যার জায়গায় বসার পর বিশ্বনাথবাবু বললেন, আমার আবার কি শীত কি গ্রীষ্ম দুবেলা চান করার অভ্যাস, তাই একটু দেরি হয়ে গেল।

ভদ্রলোকের গা থেকে দামি সাবানের গন্ধ পেয়েছি আগেই; এখন মনে হচ্ছে বোধহয় সেন্টও মেখে এসেছেন। বেশ শৌখিন লোক সন্দেহ নেই। সাদা সিল্কের শার্টের উপর গাঢ় সবুজ রঙের হাত কাটা কার্ডিগ্যান, আর তার সঙ্গে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যান্ট।

বাটি চাপা ভাত ভেঙে মোচার ঘন্ট দিয়ে খাওয়া শুরু করে দিলাম। থালার চারপাশে গোল করে সাজানো বাটিতে রয়েছে আরও তিন রকমের তরকারি, সোনা মুগের ডাল, আর রুই মাছের বোল।

বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে? জিজ্ঞেস করলেন বিশ্বনাথবাবু।

হ্যাঁ, বলল ফেলুদা। উনি আমাকে ভীষণ লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন।

বই উপহার দিয়ে?

হ্যাঁ। আজকের বাজারে ওই বই যদি পাওয়াও যেত, তা হলে দাম পড়ত কমপক্ষে পাঁচ-সাত শো টাকা।

বিশ্বনাথবাবু হেসে বললেন, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জেনে আমি বাবাকে বেশ একটু ধমকই দিয়েছিলাম। শহুরে লোকদের এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডেকে এনে কষ্ট দেবার কোনও মনে হয় না।

ফেলুদা কথাটার প্রতিবাদ করল।

কী বলছেন মিস্টার মজুমদার। আমার তো এখানে এসে দারুণ লাভ হয়েছে। কষ্টের কোনও কথাই ওঠে না।

বিশ্বনাথবাবু ফেলুদার কথায় তেমন আমল না দিয়ে বললেন, আমার তো এই চার দিনেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। বাবা যে কী করে একটানা এতদিন রয়েছেন জানি না।

বাইরে একবারেই যান না?

শুধু তাই না। বেশির ভাগ সময়ই ওঁর এই অন্ধকার ঘরে খাটের উপর শুয়ে থাকেন। দিনে কেবল দুবার কিছুক্ষণের জন্য বাগানে গিয়ে বসেন। এখন অবিশ্যি শরীরের জন্য সেটাও বন্ধ।

আপনি আর ক'দিন আছেন?

আমি? আমি কালই যাব। বাবার এখন ইমিডিয়েট কোনও ডেঞ্জার নেই। আপনারা তো বোধহয় সাড়ে আটটার ট্রেনে ফিরছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে আপনারাও যাবেন, আর আমিও বেরোব।

ফেলুদা ভাতে ডাল ঢেলে বলল, আপনার বাবার তো নানারকম শখ দেখলাম; আপনি নিজে কি একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট ব্যবসাদার?

হ্যাঁ মশাই। কাজকর্ম্ম করে আর অন্য কিছু করার প্রবৃত্তি থাকে না।

বিশ্বনাথবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন ঘরে ফিরে এলাম তখন বেজেছে প্রায় সাড়ে নটা। এখানে ঘড়ির টাইমের আর কোনও মানে নেই। আমার কাছে, কারণ সাতটা থেকেই মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির।

ফেলুদাকে বললাম, বালিশগুলোকে উলটা দিকে করে শুলে তোমার কোনও আপত্তি আছে?

কেন বল তো?

তা হলে আর চোখ খুললেই ডাকাতবাবুটকে দেখতে হবে না।

ফেলুদা হেসে বলল, ঠিক আছে। আমার কোনও আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের চাহনিটা যে আমারও খুব ভাল লাগছিল তা বলতে পারি না।

শোবার আগে ফেলুদা লণ্ঠনের আলোটাকে কমিয়ে দিল, আর তার ফলে ঘরটাও যেন আরও ছোট হয়ে গেল।

৩. চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে

চোখ যখন প্রায় বুজে এসেছে, তখন হঠাৎ ফেলুদার মুখে ইংরিজি কথা শুনে অবাক হয়ে এক ধাক্কায় ঘুম ছুটে গেল। স্পষ্ট শুনলাম ফেলুদা বলল–

দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো।

আমি কনুইয়ের ভর করে উঠে বসলাম, ব্রাউন ক্রো? কাক আবার ব্রাউন হয় নাকি? এ সব কী আবোল-তাবোল বকছ ফেলুদা?

গ্যাবোরিওর বইগুলো বোধহয় পেয়ে গেলাম রে তোপ্‌সে।

সে কী? সমাধান হয়ে গেল?

খুব সহজ।...এদেশে এসে সাহেবরা যখন গোড়ার দিকে হিন্দি শিখত, তখন উচ্চারণের সুবিধের জন্য কতগুলো কায়দা বার করেছিল! দেয়ার ওয়জ এ ব্রাউন ক্রো-এই কথাটার সঙ্গে কিন্তু বাদামি কাকের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা আসলে সাহেব তার বেয়ারাকে দরজা বন্ধ করতে বলছে।–দরওয়াজা বনধ করো। এই ত্রিনয়নের ব্যাপারটাও কতকটা সেই রকম! গোড়ায় ত্রিনয়নকে তিন ভেবে বার বার হোঁচট খাচ্ছিলাম।

সে কী? ওটা তিন নয় বুঝি? আমিও তো। ওটা তিন ভাবছিলাম।

উঁহু। তিন নয়। ত্রিনয়নের ত্রি-টা হল তিন। আর নয়ন হল নাইন। দুইয়ে মিলে থ্রি-নাইন। ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন হল ত্রি-নাইন-ও-থ্রি-নাইন। এখানে ও মানে জিরো অর্থাৎ শূন্য।

আমি লাফিয়ে উঠলাম।

তা হলে একটু জিরো মানে–

এইট-টু-জিরো। জলের মতো সোজা। –সুতরাং পুরো সংখ্যা হচ্ছে-থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। কেমন, ঢুকাল মাথায়? এবার ঘুমো।

মনে মনে ফেলুদার বুদ্ধির তারিফ করে আবার বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজতে যাব, এমন সময় আবার বারান্দায় পায়ের অওয়াজ।

রাজেনবাবু।

এত রাত্রে ভদ্রলোকের কী দরকার?

আবার ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে হল, কিছু বলবেন রাজেনবাবু?

ছোটবাবু জিজ্ঞেস করলেন। আপনাদের আর কিছু দরকার লাগবে কি না।

না না, কিছু না। সব ঠিক আছে।

ভদ্রলোক যেভাবে এসেছিলেন সেইভাবেই আবার চলে গেলেন।

চোখ বন্ধ করার আগে বুঝতে পারলাম জানালার খড়খড়ি দিয়ে আসা চাঁদের আলোটা হঠাৎ ফিকে হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মেঘের গর্জন। তারপর বেড়ালটা কেথেকে জানি দুবার ম্যাও ম্যাও করে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

সকালে উঠে দেখি ফেলুদা ঘরের জানালাগুলো খুলছে। বলল, রাত্তিরে বৃষ্টি হয়েছিল টের পাসনি?

রাত্রে যাই হোক, এখন যে মেঘ কেটে গিয়ে ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে সেটা খাটে শোয়া অবস্থাতেও বাইরের গাছের পাতা দেখে বুঝতে পারছি।

আমরা ওঠার আধা ঘণ্টার মধ্যে চা এনে দিল বুড়ো গোকুল। দিনের আলোতে ভাল করে। ওর মুখ দেখে মনে হল গোকুল যে শুধু বুড়ো হয়েছে তা নয়; তার মতো এমন ভেঙে পড়া দুঃখী ভাব আমি খুব কম মানুষের মধ্যেই দেখেছি।

কালীকিঙ্করবাবু উঠেছেন? ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

গোকুল কানে কম শোনে কি না জানি না; সে প্রশ্নটা শুনে কেমন যেন ফ্যাল-ফ্যাল মুখ করে ফেলুদার দিকে দেখল; তারপর দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাড়ে সাতটা নাগাত আমরা কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ভদ্রলোক ঠিক কালকেরই মতো বিছানায় শুয়ে আছেন। কম্বলের তলায়! তাঁর পাশের জানালাটা দিয়ে রোদ আসে বলেই বোধহয় উনি সেটাকে বন্ধ করে রেখেছেন; ঘরটা তাই সকাল বেলাতেও বেশ অন্ধকার। যেটুকু আলো আছে সেটা আসছে বরান্দার দরজাটা দিয়ে। আজ প্রথম লক্ষ করলাম। ঘরের দেয়ালে কালীকিঙ্করবাবুর একটা বাঁধানো ফোটোগ্রাফ রয়েছে। ছবিটা বেশ কিছুদিন আগে তোলা, কারণ তখনও ভদ্রলোকের গোঁফ-দাড়ি পাকতে শুরু করেনি।

ভদ্রলোক বললেন, গ্যাবোরিওর বইগুলো আগে থেকেই বার করে রেখেছি, কারণ আমি জানি তুমি সফল হবেই।

ফেলুদা বলল, হয়েছি কি না সেটা আপনি বলবেন। থ্রি-নাইন-জিরো-থ্রি-নাইন-এইট-টু-জিরো। –ঠিক আছে?

সাবাশ গোয়েন্দা! হেসে বলে উঠলেন কালীকিঙ্কর মজুমদার। নাও, বইগুলো নিয়ে তোমার থলির মধ্যে পুরে ফেলো। আর দিনের আলোতে একবার সিন্দুকের গায়ের

দাগগুলো দেখো দেখি। আমার তো দেখে মনে হচ্ছে না। ওটা নিয়ে চিন্তা করার কোনও কারণ আছে।

ফেলুদা বলল, ঠিক আছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকলেই হল।

ফেলুদা আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিকের লেখা বই চারখানা তার ঝোলার মধ্যে পুরে নিল।

তোমরা চা খেয়েছ তো? কালীকিঙ্করবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ

ড্রাইভারকে বলা আছে। গাড়ি ঝর করেই রেখেছে। তামাদের স্টেশনে পৌঁছে দেবে। বিশ্বনাথ খুব ভোরে বেরিয়ে গেছে। বলল ওর দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে সুবিধে হয়। রাজেন গেছে বাজারে। গোকুল তোমাদের জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দেবে।..তোমরা কি স্টেশনে যাবার আগে একটু আশেপাশে ঘুরে দেখতে চাও?

ফেলুদা বলল, আমি ভাবছিলাম সাড়ে দশটার ট্রেনটার জন্য অপেক্ষা না করে এখনই বেরিয়ে পড়লে হয়তো ৩৭২ ডাউনটা ধরতে পারব।

তা বেশ তো, তোমাদের মতো শহুরে লোকেদের পল্লীগ্রামে বন্দি করে রাখতে চাই না আমি। তবে তুমি আসাতে আমি যে খুবই খুশি হয়েছি–সেটা আমার একেবারে অন্তরের কথা।

৪. পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে

কাল রাত্তিরের বৃষ্টিতে ভেজা রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে পলাশী স্টেশনের দিকে যেতে আমি সকাল বেলার রোদে ভেজা ধান ক্ষেতের দৃশ্য দেখছি, এমন সময় শুনলাম ফেলুদা ড্রাইভারকে একটা প্রশ্ন করল।

স্টেশনে যাবার কি এ ছাড়া আর অন্য কোনও রাস্তা আছে?

আজ্ঞে না বাবু, বলল মণিলাল ড্রাইভার।

ফেলুদার মুখ গম্ভীর। একবার ভাবলাম জিজ্ঞেস করি ও কী ভাবছে, কোনও সন্দেহের কারণ ঘটেছে কি না; কিন্তু সাহস হল না।

রাস্তায় কাদা ছিল বলে দশ মিনিটের জায়গায় পনেরো মিনিট লাগল স্টেশনে পৌঁছতে। মাল নামিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলাম। ফেলুদা কিন্তু টিকিট ঘরের দিকে গেল না। মালগুলো স্টেশনমাস্টারের জিন্মায় রেখে আবার বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাস্তায় সাইকেল রিকশার লাইন। সবচেয়ে সামনের রিকশার মালিকের কাছে গিয়ে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, এখানকার থানাটা কোথায় জানেন?

জানি, বাবু।

চলুন তো। তাড়া আছে।

প্রচণ্ডভাবে প্যাঁক প্যাঁক করে হর্ন দিতে দিতে ভিড় কাটিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেলাম। ফেলুদার খ্যাতি যে এখান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সেটা বুঝলাম যখন সাব-ইন্সপেক্টর মিস্টার সরকার ওর পরিচয় দিতে চিনে ফেললেন। ফেলুদা বলল, ঘুরঘুটিয়ার কালীকিঙ্কর মজুমদার সম্বন্ধে কী জানেন বলুন তো।

কালীকিঙ্কর মজুমদার? সরকার ভুরু কুঁচকোলেন। তিনি তো ভাল লোক বলেই জানি মশাই। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তাঁর সম্বন্ধে তো কোনওদিন কোনও বদনাম শুনিনি।

আর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ? তিনি কি এখানেই থাকেন?

সম্ভবত কলকাতায়। কেন, কী ব্যাপার, মিস্টার মিত্তির?

আপনার জিপটা নিয়ে একবার আমার সঙ্গে আসতে পারবেন? ঘোরতর গোলমাল বলে মনে হচ্ছে।

কাদা রাস্তা দিয়ে লাফাতে লাফাতে জিপ ছুটে চলল। ঘুরাঘুটিয়ার দিকে। ফেলুদা প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনার মধ্যে শুধু একটিবার মুখ খুলল, যদিও তার কথা আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেল না।

আরথ্রাইটিস, সিন্দুকে দাগ, ডিনারে বিলম্ব, রাজেনবাবুর গলা ধরা, ন্যাফথ্যালিন–সর্ব ছকে পড়ে গেছে রে তোপ্‌সে। ফেলুমিত্তির ছাড়াও যে অনেক লোকে অনেক বুদ্ধি রাখে। সেটা সব সময় খেয়াল থাকে না।

মজুমদার-বাড়ি পৌঁছে প্রথম যে জিনিসটা দেখে অবাক লাগল সেটা হল একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডর গাড়ি। ফটকের বাইরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে এটাই নিঃসন্দেহে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ি। জিপ থেকে নামতে নামতে ফেলুদা বলল, লক্ষ কর গাড়িটাতে কাদাই লাগেনি। এ গাড়ি সবেমাত্র রাস্তায় বেরোল।

বিশ্বনাথবাবুর ড্রাইভারই বোধহয়–কারণ এ লোকটাকে আগে দেখিনি–আমাদের দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে মুখ ফ্যাকাসে করে গেটের ধারে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার? ফেলুদা প্রশ্ন করল।

আ-আজ্ঞে হ্যাঁ–

বিশ্বনাথবাবু আছেন?

লোকটা ইতস্তত করছে দেখে ফেলুদা আর অপেক্ষা না করে সোজা গিয়ে ঢুকল বাড়ির ভিতর–তার পিছনে দারোগা, আমি আর একজন কনস্টেবল।

আবার সেই প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে সেই সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে ফেলুদা এবং আমরা তিনজন সোজা ঢুকলাম কালীকিঙ্করবাবুর ঘরে।

ঘর খালি। বিছানায় কম্বলটা পড়ে আছে। আর যা ছিল সব ঠিক তেমনিই আছে, কিন্তু মালিক নেই।

সর্বনাশ। বলে উঠল ফেলুদা।

সে সিন্দুকটির দিকে চেয়ে আছে। সেটা হা করে খোলা। বেশ বোঝা যাচ্ছে তার থেকে অনেক কিছু বার করে নেওয়া হয়েছে।

দরজার বাইরে গোকুল এসে দাঁড়িয়েছে। সে থরথর করে কাঁপছে। তার চোখে জল। দেখে মনে হয় যেন তার শেষ অবস্থা।

তার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ে ফেলুদা বলল, বিশ্বনাথবাবু কোথায়?

তিনি পিছনের দরজা দিয়া পালিয়েছেন।

দেখুন তো মিস্টার সরকার!

দারোগা আর কনস্টেবল অনুসন্ধান করতে বেরিয়ে গেল।

শোনো গোকুল–ফেলুদা দুহাত দিয়ে গোকুলের কাঁধ দুটোকে শক্ত করে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল–একটিও মিথ্যে কথা বললে তোমায় হাজতে যেতে হবে। –কালীকিঙ্করবাবু কোথায়?

গোকুলের চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আজ্ঞে—আজ্ঞে—তাঁকে খুন করেছেন।

কে?

ছোটবাবু।

কবে?

যেদিন ছাটবাবু এলেন সেদিনই। রাত্তির বেলা। বাপ-বেটায় কথা কাটাকাটি হল। ছোটবাবু সিন্দুকের নম্বর চাইলেন, কর্তাবাবু বললেন—আমার টিয়া জানে, তার কাছ থেকে জেনে নিয়ো, আমি বলব না। তারপরে-তারপরে—তার কিছুক্ষণ পরে—ছোটবাবু আর তেনার গাড়ির ডেরাইভারবাবু, দুজনে মিলে—

গোকুলের গলা ধরে এল। বাকিটা তাকে খুব কষ্ট করে বলতে হল—

দুজনে মিলে কর্তাবাবুর লাশ নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই পিছনের দিঘির জলে—গলায় পাথর বেঁধে। আমার মুখ বন্ধ করেছেন ছোটবাবু-–প্রাণের ভয় দেখিয়ে!

বুঝেছি। —আর রাজেনবাবু বলে তো কোনও লোকই নেই, তাই না?

ছিলেন, তবে তিনি মারা গেছেন। আজ দুবছর হয়ে গেল।

আমি আর ফেলুদা এবার ছুটলাম নীচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁইয়ে ঘুরলেই পিছনের বাগানে যাবার দরজা। বাইরে বেরোনো মাত্র মিস্টার সরকারের চিৎকার শুনলাম—-

পালাবার চেষ্টা করবেন না মিস্টার মজুমদার—আমার হাতে অস্ত্র রয়েছে!

ঠিক সেই মুহূর্তেই শোনা গেল একটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দ আর একটা পিস্তলের আওয়াজ।

আমরা দুজনে দৌড়ে গাছ-গাছড়া ঝোপ-ঝাড় ভেঙে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের নীচে মি. সরকারের হাতে রিভলবার নিয়ে আমাদের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছেন। তেঁতুল গাছের পরেই কালকের দেখা পুকুরটা—তার জলের বেশির ভাগই সবুজ পানায় ঢাকা।

লোকটা আগেই লাফ দিয়েছে। বললেন মি. সরকার। সাঁতার জানে না। —গিরিশ, দেখো তো দেখি টেনে তুলতে পার কি না।

কনস্টেবল বিশ্বনাথবাবুকে শেষ পর্যন্ত টেনে তুলেছিল। এখন ছোটবাবুর দশা ওই টিয়াপাখির মতো; খাঁচায় বন্দি। সিন্দুক থেকে টাকাকড়ি গয়নাগটি যা নিয়েছিলেন সবই উদ্ধার পেয়েছে। লোকটা ব্যবসা করত ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে জুয়া ইত্যাদি অনেক বদ-অভ্যাস ছিল, যার ফলে ইদানীং ধার-দেনায় তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

ফেলুদা বলল, কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করার প্রায় কুড়ি মিনিট পর রাজেনবাবু হাজির হন, আর রাজেনবাবু চলে যাবার প্রায় আধা ঘণ্টা পর বিশ্বনাথবাবুর সাক্ষাৎ পাই। তিনজনকে একসঙ্গে একবারও দেখা যায়নি। এটা ভাবতে ভাবতেই প্রথমে সন্দেহটা জাগে-তিনটে লোকই আছে তো? নাকি একজনেই পালা করে তিনজনের ভূমিকা পালন করছে? তখন অ্যাকটিং-এর বইগুলোর কথা মনে হল। তা হলে কি বিশ্বনাথবাবুর এককালে শখ ছিল থিয়েটারের? তিনি যদি ছদ্মবেশে ওস্তাদ হয়ে থাকেন, অভিনয় জেনে থাকেন তা হলে এইভাবে এই অন্ধকার বাড়িতে আমাদের বোকা বানানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। হাতটা তাঁকে কম্বলের নীচে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল কারণ নিজের হাতকে মেক-আপ করে কী করে। তিয়াত্তর বছরের বুড়োর হাত করতে হয় সে বিদ্যে তাঁর জানা ছিল না; সন্দেহ একেবারে পাকা হল যখন সকালে দেখলাম কাদার উপরে বিশ্বনাথবাবুর গাড়ির টায়ারের ছাপা পড়েনি।

আমি কথার ফাঁকে প্রশ্ন করলাম, তোমাকে এখানে আসতে লিখেছিল কে?

ফেলুদা বলল, সেটা কালীকিঙ্করবাবুই লিখেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বিশ্বনাথবাবু সেটা জেনেছিলেন। তিনি আসতে বাধা দেননি। কারণ আমার বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর সংকেতটি জানার প্রয়োজন হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত আমাদের দশটার ট্রেনই ধরতে হল।

রওনা হবার আগে ফেলুদা তার সুটকেস আর ঝোলা থেকে আটখানা বই বার করে আমার হাতে দিয়ে বলল, খুনির হাত থেকে উপহার নেবার বাসনা নেই আমার! তোপ্‌সে, বুকশেলফের ফাঁকগুলো ভরিয়ে দিয়ে আয় তো।

আমি যখন বই রেখে কালীকিঙ্করবাবুর ঘর থেকে বেরোচ্ছি, তখনও টিয়া বলছে, ত্রিনয়ন, ও ত্রিনয়ন—একটু জিরো।